

নাম: মোঃ ইয়াকুব

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি, ১৯৮১

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : শ্রমিক

শাহাদাতের স্থান: বংশাল, ঢাকা

শহীদের জীবনী

মোঃ ইয়াকুব এই নাম কোনো ব্যানারে ছিল না, পোস্টারের কোণে ছাপা হয়নি। কিন্তু একটি বিধ্বস্ত ঘরের ভিতর, ছেঁড়া বিছানার পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধা মায়ের চোখে, এই নামটিই একটি গোটা মহাবিশ্বের সমার্থক। জন্ম ১ জানুয়ারি, ১৯৮১। পিতা ইউসুফ মিয়া, মাতা রহিমা আক্তারের একমাত্র সন্তান। ছেলে ও মায়ের মধ্যে ছিল এক অদৃশ্য গাঁথুনি; যেন হৃদয়ের ধমনী ধরে বেঁচে আছেন তারা দু'জনেই। এক মায়ের সকল স্বপ্ন রঙে হলো বিলীন বোনের বিয়ের পর মা এখন জামাইয়ের ঘরের এক কোনায়, ঠিক যেন কোনো বস্তু। বসবাস যে ঘরে, তা মানুষ থাকার উপযোগী নয়। বৃষ্টির দিনে হাঁটুসমান পানি উঠে যায়, ছাদের ফাটল দিয়ে ঝরে জল, আর দেয়ালের রং চুলকানো ক্ষত হয়ে ঝরতে থাকে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন ঘর কেবল ঠাই নয়, তা এক নির্জন শ্মশান যেখানে মায়েরা বাঁচে না, শুধু নিঃশ্বাস নেয়। মা বলেছিলেন, "কখনো ভাবি নাই, নিজের মেয়ের জামাইয়ের ঘরে আশ্রিত হয়ে থাকবো, ছেলে চলে গেছে আমি কোথায় যাবো?" এটুকু বলা যত সহজ, সেই উচ্চারণের ভিতর গুমরে থাকা যন্ত্রণা; তা ভাষার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাঁর ছেলেকে শুধু সন্তান হিসেবে ভালোবাসেননি তাঁর জীবনের কারণ ছিলেন ইয়াকুব। তাঁর যত জমানো স্বপ্ন, বিশ্বাস, আশ্রয় সবই ছিল ওই ছেলেটির শরীরের উপর নির্ভর করে। ইয়াকুব কোনো অফিসে চাকরি করতেন না, তাঁর নামে কোনো সনদ নেই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা নেই কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল এক ভয়হীন, পবিত্র ন্যায়বোধ। অন্যায়ের সংবাদ শুনলে স্থির থাকতে পারতেন না। একজনের মৃত্যুতে কাঁপতেন, আর বলতেন, "মা, অন্যদের ছেলেরা মরছে, আমি বসে আছি আমিও যাবো।" তখন মা গলা ধরে বোঝাতেন, "তুই গেলে আমি বাঁচবো কিভাবে?" কিন্তু এই ছেলে পৃথিবীর নিয়মে গড়া সন্তান ছিল না সে ছিল অন্যরকম এক আশুনা, যে ভাবত, "আল্লাহ দেখছেন। আর যদি তিনি দেখেন, তবে আমার চূপ করে থাকা চলে না।" তাই সে গিয়েছিল। শহরের এক উত্তপ্ত দুপুরে, রাস্তায় রাস্তায় তখনো গুলির শব্দ, আর চিৎকারে বাতাস ছিন্নভিন্ন। সেই মুহূর্তে ইয়াকুব ছিলেন সামনে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না তিনি। জানতেন, তাঁর মৃত্যু কেউ গণনা করবে না; তাঁর নাম হবে না কোনো গণমাধ্যমে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন দেখছেন। সেই বিশ্বাসেই শহীদ হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর মা বেঁচে আছেন কিন্তু যেন এক দাহশালা-সম জীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন। কোনো ভাত নেই ঠিকমতো, ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই। তাঁর চোখের নিচে শুকনো রেখা, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হলো সেই শূন্যতা যেখানে ছেলে ফিরে আসে না, আর কেউ "মা" বলে ডাকেও না।

মোহাম্মদ ইয়াকুব আমাদের রাষ্ট্রের কাছে এক সংখ্যা কিন্তু তাঁর মায়ের কাছে তিনি ছিলেন বেঁচে থাকার শেষ কারণ। এই শহীদের রক্ত শুধু মাটিতে মিশে যায়নি, তা মিশে গেছে এক বাঙালি মা'র অন্তর্গত আত্মায়। যতদিন সেই মাটি আছে, এই নামটিও বেঁচে থাকবে।

জুলাইয়ের আশুনা: যে আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল ইয়াকুবদের

বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক শোক, অনেক জুলুম কিন্তু জুলাই ২০২৪ যেন তার মাঝে এক লাল-কালো রক্তছাপ দিয়ে লেখা অধ্যায়। এটি কেবল একটি আন্দোলনের সময়কাল নয়। এটি ছিল রাষ্ট্র নামক জুজুবরার মুখোশ খুলে ফেলার সময়। এখানে গুলি করেছিল তারা, যাদের দায়িত্ব ছিল রক্ষা করা। এখানে পেটাতে নেমেছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ যাদের বলা হয় ভবিষ্যতের নেতৃত্বের মুখ। কিন্তু রাজপথে দাঁড়িয়েছিল এক ঝাঁক তাজা প্রাণ। তাদের কারও নাম কেউ জানে না, তাদের বাড়ি কোথায় কেউ জানে না, শুধু জানে তারা এসেছিল বুক পেতে দাঁড়াতে, অন্যের গুলির মুখে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হয়েছিল উত্তাল ঢেউ। কিন্তু এটা কোনো ফেসবুক পেজের আহ্বান ছিল না; এটা ছিল হাজারো বছরের জমে থাকা বঞ্চনার গর্জন। একটা রাষ্ট্র যখন নাগরিকের কণ্ঠ রোধ করে, তখন সেই কণ্ঠস্বর পাহাড় ভেদ করে বের হয়ে আসে। রংপুরের শহীদ আবু সাঈদের মৃত্যু তা যেন আশুনে ঘি ঢেলে দিলো। কেউ আর পেছনে ফিরলো না। আন্দোলনের ভাষা বদলে গেল। দাবির কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেল। কোটা তখন শুধু একটি নীতির প্রশ্ন নয়, তা হয়ে উঠলো "আমার জীবন কেন তুচ্ছ হবে তোমার ক্ষমতার কাছে?"

এই হলো সেই মুহূর্ত, যখন ইয়াকুবদের জন্ম হয়। ইয়াকুব একটি নাম, একটির মতোই হাজারো মুখ। কারও মা তাঁকে ডাকে "বাবা", কারও বন্ধু বলে "ভাই", কিন্তু রাষ্ট্র বলে "অসন্তোষকারীদের একজন"। ইয়াকুব ছিলেন না কোনো নেতা, কোনো সংগঠনের মুখপাত্র। তিনি ছিলেন এক সাধারণ মানুষ, যাঁর রক্তে ছিল প্রতিরোধের নেশা, ন্যায়ের নেশা। রাতে বাড়ি ফিরতেন চুপচাপ, চোখেমুখে ক্লান্তি, কিন্তু হৃদয়ে ঝড়। মা জিজ্ঞেস করলে হাসতেন কিন্তু সে হাসির আড়ালে ছিল এক বিদ্রোহ, এক দায়। মা বুঝতেন না সব, তবু বলতেন, "কাক ডাকে মাথার উপর, আমার বুক কাঁপে।" জুলাইয়ের সেই দিনগুলোতে ঘর মানে ছিল ভয়ের দেয়াল। ছেলেরা ফিরবে কি না, মায়েরা জানতেন না। কিন্তু আবার সকালে বেরিয়ে যেতো তারা কারণ তারা জেনে গিয়েছিল, ঘরে থাকলে মরবে একা, পথে গেলে মরবে সবাই মিলে, মর্যাদা নিয়ে। এই হলো সেই বিদ্রোহের ভাষা, যা পুঁথিতে লেখা যায় না এটা জন্মায় নিপীড়নের গর্ভে। রাষ্ট্র চেয়েছিল এই আশুনা নিভিয়ে দেবে গুলি দিয়ে, মামলা দিয়ে, নির্যাতন দিয়ে। কিন্তু তারা জানতো না, একবার যদি কারও ভেতরে "আমিও মানুষ" এই চেতনা জেগে ওঠে, তখন তাকে আর দমন করা যায় না। জুলাই ২০২৪-এর আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, কোনো ক্যাম্পেইনের নয়। এটা ছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের অসাধারণ হওয়ার গল্প। এই আন্দোলনের বুকেই জন্ম নেয় ইয়াকুবরা যারা গোপনে রাতের আঁধারে পোস্টার সাঁটায়, যারা ভোরে প্ল্যাকার্ড লিখে, যারা পুলিশের লাঠিতে পড়ে যায় কিন্তু বলে, "আমি আবার আসবো।" এখানে বিপ্লব ছিল না কোনো নেতার ভাষণে। এখানে বিপ্লব ছিল একটি মায়ের প্রার্থনায়, একটি সন্তানের যুদ্ধে, একটি জাতির ঘুম ভাঙায়। আর এই বিপ্লব যতদিন থাকবে স্মৃতিতে, ততদিন ইয়াকুবরাও বেঁচে থাকবে প্রতিটি নীরব গুলির ভিতর।

ইয়াকুবের শেষ দিন: এক রক্তাক্ত সকাল, এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা ০৫ আগস্ট ২০২৪, দিনটা মনে আছে ভালো করে সেই বিভীষিকাময় লাল জুলাইয়ের শেষভাগ, যখন প্রতিটি সকাল যেন নতুন এক শোকবার্তা বয়ে আনতো। সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল রাজধানীর রাজপথে। কোথাও ছাত্ররা জড়ো হচ্ছে, কোথাও আবার গুলির গুঞ্জন। তখনও কেউ জানত না, এই দিনের ইতিহাস লেখা হবে একটি মায়ের বুক চিরে, একটি সন্তানের রক্ত দিয়ে। ঘড়ির কাঁটা বলছিল ১১টা ১৫। হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে “গুলির ঘটনা ঘটেছে, ইয়াকুব গুলিবিদ্ধ।” খবরটা যখন মায়ের কানে পৌঁছায়, তিনি তখন ঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে ছিলেন কেন জানি বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল। কেউ এসে বললো, “আপনার ছেলেকে গুলি করা হয়েছে।” কিন্তু কেউ জানালো না, কোথায়। কেউ মুখে বললো না, কী হয়েছে। শুধু চোখে চোখে একধরনের কফিনের নীরবতা ছিল। মা তখন রাস্তায় নেমে পড়েন, পাগলের মতো ছুটে থাকেন হাসপাতালের পথ ধরে, কিন্তু কোথাও ছেলেকে খুঁজে পান না। কেউ কিছু বলে না। আশপাশের মানুষ যেন এক গভীর শূন্যতা বয়ে বেড়ায়। তাতেই মা বুঝে যান এই নীরবতা কথার চেয়েও বেশি নির্মম। ছেলোটো আর নেই। তারপর আসে সন্ধ্যা। ঘরজুড়ে তখন শুধু কান্না আর ক্যামেরা। ইয়াকুবের লাশ আনা হয় প্রাস্টিক মোড়ানো ব্যাগে, মা ছুটে যান, তাঁকে কেউ লাশ স্পর্শ করতে দেয় না। কিন্তু যখন তাঁকে ছেলের গায়ে রাখে, তখন সেই শরীরের উষ্ণতা নেই, আছে শুধু এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা যা মায়ের বুকো ও নেমে আসে। মা বলছিলেন, চোখের পানি থামছিল না “ওর রক্তে আমার সাদা জামাটা লাল হয়ে গিয়েছিল। শুধু জামা নয়, আমি নিজেও যেন রক্তে স্নান করলাম।” প্রতিবেশীরা ভিড় করে, মিডিয়ার ক্যামেরা ঘোরে, কেউ মা’র মুখ চায় টিভিতে দেখতে কিন্তু সেই মুখে আর কিছু নেই। শুধু একটা চিৎকার “আমার একটাই ছেলে ছিল, ও নেই, আমি বাঁচবো কীভাবে?”

এই মৃত্যু কেবল একটি সন্তানের নয়, এটি ছিল একটি যুগের মৃত্যু। একটি বৃকে গজিয়ে ওঠা সাহসের মৃত্যু। এক নিতীক প্রতিবাদের মৃত্যু। এবং রাষ্ট্র যে কিনা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংরক্ষণে সে নিজেই হয়ে উঠলো হত্যার হস্তারক। কেউ বিচার চায়নি তখন, মা-ও না। তিনি শুধু চাইছিলেন, যদি একবার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারতেন। কিন্তু আন্দোলনের সন্তানদের এমনটিই হয় তারা ফিরে আসে না জীবিত, আসে ঝড়ের মতো, চলে যায় বিদ্রোহের মতন। আর রেখে যায় অসীম শূন্যতা। মায়ের সেই কান্না এখনও বাতাসে ভেসে বেড়ায়। শুধু তিনি নন, এই দেশের মাটির গায়ে এখনো লেগে আছে ইয়াকুবের রক্তের গন্ধ। সে গন্ধ শুধু গুলির নয় তা হলো রাষ্ট্রের আত্মঘাতী নৈঃশব্দের প্রতিচ্ছবি।

"শুধু শ্বাস নেই, বেঁচে নেই"

শহীদ ইয়াকুবের মায়ের নিঃসঙ্গতা

আজ রহিমা আক্তার একা। ছেলের মৃত্যুর পর তিনি আর মা নন, আর মানুষও নন তিনি যেন এক স্মৃতিচারণে বন্দী অবশ দেহমাত্র। তাঁর চারপাশে যেন সব কিছু থমকে আছে, অথচ সময় চলছে নিষ্ঠুর, উদাসীন, অচেনা। আগে যেখানে প্রতিদিনের শুরু হতো ছেলের ডাকে, “মা, নাস্তা করো,” এখন ঘরের কোণটায় চুপচাপ বসে থাকেন তিনি, চেয়ে থাকেন দেয়ালে, যেখানে ইয়াকুবের একটা ফ্রেম বাঁধানো ছবি ঝুলে আছে চোখে আগুন, কপালে ঘাম, মুখে এক চিলতে ধৈর্য। সেই ছবির চেয়ে বাস্তব কিছু নেই এখন তাঁর কাছে।

ঘরটা ছোট, ছাদের কোনো থেকে পানি পড়ে, রান্নাঘরে তিনদিনে একবার হয় কিছু, আর মা নিজেই ভুলে যান খেতে। তাঁর সন্তান ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন, একমাত্র উপার্জনস্রোত, ভালোবাসার একমাত্র কেন্দ্র। সেই অবলম্বনকে এক গুলির শব্দে, এক রাষ্ট্রীয় মিছিলে, এক নির্মম নিঃশ্বাসে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন, মা বলেন, “আমি তো এখনও শ্বাস নেই, কিন্তু বেঁচে নেই কারণ আমি জানি, ও ছাড়া আমার কোনো দিন আর আসে না।”

মা এখন আশ্রিত। মেয়ে আছে, কিন্তু মেয়ের সংসারে মা যেন একটা বোঝা খরচ বাড়ে, সময় লাগে, দৃষ্টি এড়াতে হয়। জামাই মুখে কিছু না বললেও মা জানেন, তাঁর উপস্থিতি আজ অতিরিক্ত। তিনি এখন বুঝে গেছেন, ছেলে না থাকলে মা থাকেন না মা হয়ে ওঠেন অতীতের ছায়া। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি চুপচাপ ছেলের নাম ধরে ডাকেন, কেউ জবাব দেয় না, দেয়ার কেউ নেই। আর্থিক দুঃখকষ্টের কথা মা বলেন না, কিন্তু জানানো যায় একটা ভাঙা চায়ের কাপেও এখন ইতিহাস জমে থাকে। গ্যাসের বিল জমে যায়, ওষুধ কেনা হয় না, ফ্যান চলে না ঠিকমতো তবুও মা বাঁচতে চান, শুধু এজন্য যে তাঁর ছেলের নামটা কেউ যেন মনে রাখে। তিনি বলেন, “ও তো কোনো অপরাধ করেনি, কোনো রাষ্ট্রদ্রোহ করেনি। শুধু বলেছিল ‘যারা মরছে, তারা তো কারও সন্তান। আমি কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকবো, মা?’”

সেই প্রশ্নটাই এখন বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ইয়াকুব নেই, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন রয়ে গেছে আমাদের দিকে চেয়ে থাকা এক জ্বলন্ত চোখ হয়ে। সেই চোখে এখন আগুন নেই, আছে চিরস্থায়ী শোক, যা আমাদের নীরবতাকে অভিশাপ দেয়। মা শুধু চায়, কেউ যেন একবার উচ্চারণ করে “ইয়াকুব শহীদ, কারণ সে মানুষ ছিল।” এই দেশ যে আজও দাঁড়িয়ে আছে, তা ইয়াকুবদের মত নামহীন নায়কদের রক্তে ভেজা মাটি। কিন্তু মায়ের কাছে এসব কিছু না তিনি চান না ইতিহাস, চান না ছবি। তিনি শুধু চান রাতে ঘুমানোর আগে যেন কেউ একবার বলে, “তোমার ছেলোটো ন্যায়ের পক্ষে ছিল, মা।” আর এই চাওয়া এই ক্ষীণ আশ্রয়টাই, তাঁর জীবনের শেষ বেঁচে থাকা।

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকারের দায়িত্ব

অন্তর থেকে বলি এই শহীদের জন্য রাষ্ট্র, সমাজ আর ইতিহাস তিন স্তম্ভই একত্রে দায়বদ্ধ। ইয়াকুবের আত্মত্যাগ যেন মুছে না যায় এই ভাঙা দেওয়াল আর ধূসর জঙ্গলে। তার মায়ের দিনগুলো কেটে যায় এক অনাকাজ্জিত মৃত্যুর মতো ধীরে, নীরবে, অদৃশ্য বেদনায়। প্রথম প্রস্তাব রাষ্ট্র যেন মা রহিমা আক্তারকে দেয় একটি স্থায়ী আশ্রয়। যেন আর বোনের জামাইয়ের সংসারে ‘বোঝা’ হয়ে থাকতে না হয়, যেন তার বুক ভরে শান্তি ও মর্যাদা। দ্বিতীয়ত, তার পরিবারকে অবশ্যই দেওয়া হোক মাসিক সম্মানভাতা এক রক্তসিক্ত ছেলের ত্যাগের বিনিময়ে যেন মা অন্তত ঔষধ কিনে নিতে পারেন, পেট ভরে খেতে পারেন, মানবিক জীবন যাপন করতে পারেন। ইয়াকুব মারা যাননি কেবল গুলিতে; তিনি মরে গেছেন সমাজের নিপ্ৰাণ নিরবতায়। আর আজ যদি আমরা অচেতন থাকি, কোনও পদক্ষেপ না নেই, তবে আমরা নিজেই হয়ে যাব তার হত্যার সহযোগী। অভিশপ্ত হবে আমাদের বিবেক।

এই দায়িত্বের পালা এখন আমাদের হাতে নিরবতা নয়, কণ্ঠ ওঠার সময়।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম : মো: ইয়াকুব

জন্ম তারিখ : ০১ জানুয়ারি ১৯৮১

পিতা : ইউসুফ মিয়া (মৃত)

মাতা : রহিমা আক্তার

ভাই-বোন : এক বোন: মোছা: শাহজাদী বেগম, বিবাহিত

বর্তমান পারিবারিক অবস্থা : মা রহিমা আক্তার বোনের বাসায় থাকেন

বর্তমান ঠিকানা : হোল্ডিং: ৫৮, নাজিমউদ্দিন রোড, বংশাল (সাবেক কোতয়ালী), ঢাকা

শহীদ হওয়ার তারিখ : ০৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল আনুমানিক ১১:১৫ টা

শহীদ হওয়ার স্থান : বাসার পাশে কলেজের সামনে; গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মৃত্যুবরণ

আঘাতের ধরণ : মাথায় গুলিবিদ্ধ ; মাথার পেছনের অংশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাথা থেকে আলাদা হয়ে যায়

দাফনস্থল : আজিমপুর কবরস্থান; সন্ধ্যায় দাফন, মিডিয়া ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে

অর্থনৈতিক অবস্থা : চরম সংকটাপন্ন